তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

প্রিয় শিক্ষার্থী!

তোমরা জানো, কুরআন মাজিদ হলো আমাদের ধর্মগ্রন্থ। এটি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। আর হাদিস হলো মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ ইসলামি শরীয়তের প্রধান দুটি উৎস। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে (মেনে চললে) তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসুলের সুন্নত।' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে মানব জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইতোপূর্বে তোমরা এসম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করেছ, এবার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

আল কুরআনের পরিচয়

কুরআন আরবি শব্দ। এর অর্থ পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রতিদিন কোটি কোটি মুসলমান এই কিতাব তিলাওয়াত করে থাকে। এজন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে আল কুরআন। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এ কিতাবটি নাযিল করেন। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন ভালোবাসা ও রহমতের নিদর্শন। মানুষের দুনিয়ার জীবন যাতে সফল, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হয় এবং সেই সাথে পরকালীন জীবনের অনাবিল শান্তিও যেন সে লাভ করতে পারে তার বিস্তারিত পথ নির্দেশনা এ কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এক মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ।

আল-কুরআন এমন একটি কিতাব যার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত এটি অবিকৃত রয়েছে। কেউ এর একটি অক্ষর, শব্দ বা হরকতও পরিবর্তন করতে পারেনি। এটি যেভাবে নাযিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান আছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এটি অবিকৃতই থাকবে। কেননা এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯)

কুরআন মাজিদ অবতরণ

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আল-কুরআন নাজিল করেন। এটি লাওহে মাহফুয বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। লাওহি মাহফুজ থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানে 'বাইতুল ইযযাহ' নামক স্থানে এক সাথে নাজিল করা হয়। এরপর সেখান থেকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের সূচনা হয়েছিল মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায়, ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে। তখন মহানবি (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। এটি সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। এটি মানব জাতিকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য সব উপদেশ এতে বর্ণিত হয়েছে। এটি সর্বপ্রকার দোষত্রুটি, সংশয় সন্দেহ ও ভুলের উর্ধ্বে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ: 'এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথপ্রর্দশক।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২)

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বমোট ১০৪ (একশত চার) খানা আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে ১০০ (একশত) খানা ছোট কিতাব। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর ৪ (চার) খানা বড় কিতাব। এগুলো হলো: তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কেয়ামত পর্যন্ত এটি সকল মানুষের হেদায়েতের উৎস। এরপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না।

কুরআন মাজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাযিলকৃত। এতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষায় নানা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অতিসাধারণ মানুষও এ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল কুরআন ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। মানব জাতির জীবন পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের মূল শিক্ষাও এতে বর্ণিত রয়েছে। এটি কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠি বা দেশের জন্য অবতীর্ণ হয়নি, বরং এটি সর্বকালের সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

আল-কুরআনের গুরুত্ব

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানব জাতির হেদায়েতের প্রধান উৎস। এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, তাঁর গুণাবলির বর্ণনা, তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আসমান-জমিন, সৌরজগৎ, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, পর্বত, সাগর-মহাসাগর সবকিছু সম্পর্কেই এতে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতির স্বভাব-প্রকৃতি, আত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক অধঃপতন ও এর পরিণতির কথা এতে বিধৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা, নবি-রাসুলগণের বিবরণ, পূণ্যবান ও পাপীদের অবস্থা এবং ইহ-পরকালের নানান অদৃশ্য ও অজানা বিষয় এ মহাগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাই আল-কুরআন বহুবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদণ্ড।

আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধান ও আইনকানুন বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করবে এর দিকনির্দেশনাও আল-কুরআনে বর্ণিত আছে। এটি মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা চিরসত্য ও সুন্দর পথে পরিচালিত করে। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, অমূল্য ও অদ্বিতীয় সম্পদ। এর গুরুত্ব বর্ণনায় মহানবি (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই কুরআন আল্লাহর রজ্জু (রশি), অতি উজ্জ্বল আলো এবং উপকারী মহৌষধ। যে ব্যক্তি (কুরআন) দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে তার জন্য এটা মুক্তির সনদ হবে এবং যে এটা মেনে চলবে সে নাজাত পাবে (কানযুল উম্মাল)।

কুরআন তিলাওয়াত (تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ)

পরিচয়

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, পড়া, আবৃত্তি করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামের পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলে। আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং একে আরবিতেই পড়তে হবে। তোমরা যেমন বাংলা ও ইংরেজি পড়তে শিখেছ, তেমনি আরবি পড়াও শিখতে হবে। এজন্য আরবি হরফ বা বর্ণসমূহ চিনতে হবে, আরবি শব্দ ও বাক্য পড়া জানতে হবে, সাথে তাজবিদের কিছু নিয়ম-কানুনও শিখতে হবে। তাজবিদ হচ্ছে আল-কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি। এভাবে আরবিতে সুন্দর করে স্পষ্ট উচ্চারণে আল কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলে।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

আল-কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক। এটি মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। এতে মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াত করলে আমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানতে পারব ও সে অনুযায়ী আমল করতে পারব। আমরা বুঝে বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করব যাতে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতেন। কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা সালাতে কুরআন পড়তে হয়। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। কুরআন স্বয়ং অশুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য অভিশাপ দেয়। সুতরাং আমরা গুরুত্ব সহকারে শুদ্ধরুপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব, প্রতিদিন তিলাওয়াত করব এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কী বলেছেন তা বুঝার চেষ্টা করবো ।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

কুরআন তিলাওয়াতের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা হলো উত্তম ইবাদাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা, কুরআন কিয়ামত দিবসে পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। যে ঘরে কুরআন পড়া হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) তিলাওয়াতের জন্য দশটি করে সওয়াব লেখা হয়।' (মুসনাদ আহমাদ)

কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত পূণ্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। সুতরাং আমরা সবাই সাধ্যমত নিয়মিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত করব এবং অন্যদেরকেও কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত করব।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজিদ দেখে দেখে অথবা মুখস্থ যেভাবেই পাঠ করা হোক তাতে সাওয়াব রয়েছে। তাই সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর স্বরে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমরাও শুদ্ধ এবং সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করব।

তাজবিদের পরিচয়

তাজবিদ শব্দের অর্থ- উত্তম বা সুন্দর করা। আল কুরআনকে সহিহ-শুদ্ধরূপে পড়ার জন্য বেশকিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। এসব নিয়ম-কানুনসহ আল-কুরআনকে শুদ্ধরুপে সুন্দর করে পাঠ করাকে তাজবিদ বলে। আরবি হরফসমূহ বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হামযা (ء) ও হা (ه)। কণ্ঠনালীর মধ্যখান থেকে উচ্চারিত হয় আইন (ع) ও হা (ح)। এরকম আরবি হরফসমূহ উচ্চারিত হওয়ার স্থানকে মাখরাজ বলে।

এছাড়া আরবি হরফ কোনোটি মোটা করে পড়তে হয়, আবার কোনোটি চিকন করে পড়তে হয়। উচ্চারণের এ বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সিফাত। যেমন: ت (তা) এবং ط (ত্ব) হরফ দু'টির উচ্চারণের স্থান একই। কিন্তু এদের সিফাত ভিন্ন। এ দুটো হরফের মধ্যে ط (ত্ব) কে মোটা করে পড়তে হয় আর ت (তা) কে চিকন করে পড়তে হয়। এভাবে মাখরাজ, সিফাত ও আরও কিছু নিয়ম-কানুন ঠিক রেখে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করাই তাজবিদ।

তাজবিদের গুরুত্ব

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুণাহ হয়। এতে অনেক সময় আল-কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন: সূরা ইখলাসে এসেছে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ বলুন (হে নবি) ! তিনি আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। এখানে قُلْ শব্দের অর্থ বলুন। আর যদি ق (ক্বাফ) কে ভুল মাখরাজ থেকে উচ্চরণ করে বলা হয় كُلْ তাহলে এর অর্থ হয় খাও বা ভক্ষণ কর। ফলে আল- কুরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটে। যা কোনোভাবেই বৈধ নয়। তাজবিদ সহকারে শুদ্ধ ও সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

অর্থ: 'কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত : ৪)
মহান আল্লাহ তাজবিদ সহকারে কুরআন পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন পাঠ করার অনেক ফজিলত বা মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রিয়নবি (সা.) বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।' (বুখারি)
সুতরাং আমরা তাজবিদ সহকারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব।

মাখরাজ (مَخْرَجٌ)

প্রিয় শিক্ষার্থী, কুরআনকে সহিহ-শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করার জন্য যে কয়টি নিয়ম জানা খুবই জরুরি, তার মধ্যে মাখরাজ অন্যতম। মাখরাজ শব্দটি আরবি। শব্দগত দিক থেকে অর্থ হলো- বের হওয়ার স্থান, উচ্চারণের স্থান।

পরিভাষায় আরবি হরফ (বর্ণ) সমূহের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। আরবি ভাষায় মোট হরফ রয়েছে ২৯টি। এগুলো ১৭টি মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এই ১৭টি মাখরাজ আবার মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত। মুখের যে স্থানগুলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো:

মুখের স্থান	মাখরাজ সংখ্যা
১. জাওফ বা মুখের খালি জায়গা	০১টি
২. হলক বা কণ্ঠনালি	০৩টি
৩. জিহ্বা	১০টি
৪. উভয় ঠোঁট	০২টি
৫. নাসিকামূল	০১টি

মাখরাজের বিবরণ

এক নম্বর মাখরাজ: জাওফ অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এ স্থান থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয় যথাঃ

ক. আলিফ (ا) যখন এর পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমন: بَا

খ. জযম বিশিষ্ট ওয়াও (و) যখন এর পূর্বের হরফে পেশ হয়। যেমন : بُوْ

গ. জযম বিশিষ্ট ইয়া (ي) যখন এর পূর্বের হরফে যের হয়। যেমন : بِيْ

দুই নম্বর মাখরাজ : কণ্ঠনালির নিম্নভাগ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়। এ দুটি হলো হামযা (ء) ও হা (ه)। যেমন: أَا – إِه

তিন নম্বর মাখরাজ: কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে (ح) ও (ع) এ দুটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন: أَعْ –أَحْ

চার নম্বর মাখরাজ: কণ্ঠনালির উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো খা (خ) ও গাইন (غ)। যেমন: اَغْ – اَخْ

পাঁচ নম্বর মাখরাজ: জিহবার গোড়া এবং তার বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। এটি হলো ক্বাফ (ق) । যেমন أَقْ

ছয় নম্বর মাখরাজ: জিহবার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে (ك) উচ্চারণ করতে হয়। যেমন: اَكْ

সাত নম্বর মাখরাজ: জিহবার মধ্যভাগ এবং এর সোজা উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এগুলো হলো - জিম (ج), শিন (ش), ইয়া (ي)। যেমন أَيْ– أَشْ– أَجْ

আট নম্বর মাখরাজ: জিহবার পার্শ্বভাগ ও উপরের পাটির দাঁতের মাড়ি। এ দুই-এর সংযোগে উচ্চারিত হয় দোয়াদ (ض) হরফটি। যেমন: أَضْ

নয় নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে মিলে উচ্চারিত হয় একটি হরফ। এটি হলো - লাম (ل) । যেমন: أَلْ

দশ নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ ও তার বরাবর উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় নুন (ن) হরফ। যেমন: أَنْ

এগারো নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগের পিঠ এবং সোজা উপরের তালু। এখান থেকে উচ্চারিত হয় রা (ر)। যেমন: أَرْ

বারো নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ এবং সামনের উপরের দাঁতের গোড়া। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। এগুলো হলো তা (ت), দাল (د), ত্ব (ط)। যেমন: أَتْ- أَدْ- أَطْ

তেরো নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ ও সামনের নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং উপরের দাঁতের সামান্য অংশ মিলে উচ্চারিত হয় মোট তিনটি হরফ। এগুলো হলো যা (ز), সিন (س), সোয়াদ (ص) যেমন: أَزْ- أَسْ- أَصْ

চৌদ্দ নম্বর মাখরাজ: জিহবার অগ্রভাগ ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের মাথা। এখান থেকে উচ্চারিত হয় ছা (ث), যাল (ذ), যোয়া (ظ)। যেমন: اَثْ- اَذْ - اَظْ

পনেরো নম্বর মাখরাজ: নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ বা ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের মাথা। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় ফা (ف)। যেমন : أَفْ

ষোল নম্বর মাখরাজ: দুই ঠোঁট। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। যথা –

১. বা (ب) উচ্চারিত হয় নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ থেকে। যেমন: بْأَ
২. মীম (م) উচ্চারিত হয় ঠোঁটের বাইরের বা শুষ্ক অংশ থেকে যেমন: مْأَ
৩. ওয়াও (و) এ হরফ উচ্চারণে দুই ঠোঁট সরাসরি মিলিত হয় না। বরং উভয় ঠোঁট ডান ও বাশ পাশ থেকে গোল হয়ে অর্ধফোটা ফুলের মতো মধ্যস্থলে ছিদ্র রেখে উচ্চারিত হয়। যেমন: وْأَ

সতেরো নম্বর মাখরাজ: নাসিকামূল। এখান থেকে গুন্নাহসমূহ উচ্চারিত হয়। যেমন : জযমযুক্ত নুনকে কখনো কখনো গোপন করে নাসিকামূল থেকে উচ্চারণ করা হয়। তাশদিদযুক্ত নুনের মাখরাজও এটিই। যেমন: مِنْ شَرِّ - إِنَّ

অর্থ ও পটভূমিসহ আল-কুরআনের কতিপয় সূরা

সূরা আল-ফাতিহা (سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ)

পরিচয়

আল-ফাতিহা কুরআন মাজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এটি কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম সূরা। ফাতিহা অর্থ সূচনা, শুরু, আরম্ভ, ভূমিকা, মুখবন্ধ ও উপক্রমণিকা। যেহেতু এ সূরা কুরআন মাজিদের শুরুতে অবস্থিত, সে জন্য এ সূরার নাম করণ করা হয়েছে আল-ফাতিহা। এ সূরা দ্বারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাত শুরু করা হয়। এটি কুরআন মাজিদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাযিলকৃত সূরা। এটিকে ফাতিহাতুল কিতাব বা ফাতিহাতুল কুরআনও বলা হয়। যার অর্থ কিতাব বা কুরআনের সূচনা বা ভূমিকা।

এটি একটি মাক্কী সূরা। মহানবি (সা.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বে এটি নাযিল হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা সাতটি। অন্যান্য সূরার ন্যায় এ সূরার নাম মাত্র একটি নয় বরং এটির অনেকগুলো নাম রয়েছে। এমনকি অনেকে এ সূরার পঁচিশটি পর্যন্ত নাম উল্লেখ করেছেন। এ নামগুলোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল) : আরবিতে উম্ম অর্থ মা বা মূল। এ সূরাটির ভেতর সমগ্র কুরআনের মূল আলোচনা সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে বিধায় এটিকে উম্মুল কুরআন বলা হয়।

২. সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা): এ সূরায় মহান আল্লাহর উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সেজন্য এ সূরার নাম সূরাতুল হামদ।

৩. সূরাতুস সালাত (নামাযের সূরা): প্রত্যেক সালাতে এ সূরা পাঠ করা অপরিহার্য। এটি ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হয়না। তাই এটিকে সূরাতুস সালাত বলা হয়।

৪. সূরাতুশ শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূরা): এ সূরার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই এটিকে সূরাতুশ শোকর বলা হয়।

৫. সূরাতুদ দোয়া (দোয়া বা প্রার্থনামূলক সূরা) : এ সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। এ জন্য এ সূরার আর এক নাম মুনাজাত।

৬. আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি) : সমগ্র কুরআনে যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এ সূরায় বর্ণিত কয়েকটি বাণীর উপর। তাই এটিকে আসাসুল কুরআন বা কুরআনের ভিত্তি বলা হয়।

৭. সূরাতুশ শিফা (রোগমুক্তির সূরা):
এ সূরার প্রভাবে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাই এ নামকরণ করা হয়।

৮. আস-সাবউল মাছানী (নিত্য পাঠ্য সাতটি আয়াত): সূরা আল-ফাতিহাতে সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা নামাযের প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করা হয় বলে এর নাম আস-সাবউল মাছানী।

শব্দার্থ

اَلْحَمْدُ	সমস্ত প্রশংসা	نَعْبُدُ	আমরা ইবাদাত করি
لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য	نَسْتَعِيْنُ	আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি
رَبِّ	প্রতিপালক, স্রষ্টা, রব	اِهْدِنَا	আমাদেরকে পথ দেখাও
اَلْعٰلَمِيْنَ	জগৎসমূহ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ	اَلصِّرَاطَ	পথ, রাস্তা
اَلرَّحْمٰنِ	পরম দয়াময়	اَلْمُسْتَقِيْمَ	সহজ, সরল, সোজা
اَلرَّحِيْمِ	পরম দয়ালু	اَلَّذِيْنَ	যারা/যাদের
مٰلِكِ	মালিক, অধিপতি	اَنْعَمْتَ	তুমি অনুগ্রহ করেছ
يَوْمِ الدِّيْنِ	বিচার দিবস, কর্মফল দিবস, প্রতিদান দিবস	اَلْمَغْضُوْبِ	ক্রোধে-নিপতিত
اِيَّاكَ	শুধু আপনারই/ শুধু তোমারই	اَلضَّآلِّيْنَ	পথভ্রষ্ট

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়,পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ	সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ	যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ	যিনি বিচার দিনের মালিক।
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ	আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ	আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর,
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ	তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۠	তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা

কুরআন মাজিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে আল-ফাতিহা। এ সূরায় সমগ্র কুরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কুরআনে ইমান ও নেক আমলের আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সূরায় উক্ত মূলনীতি দুটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরাটি মূলত আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম। এর প্রথম তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষ তিন আয়াতে মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহর নিকট মুনাজাত, প্রার্থনা ও মনের পরম আকুতি-মিনতি জানানো হয়েছে। আর মধ্যের একটি আয়াতে একত্রিতভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ বলেন- 'সুরাতুল ফাতিহা আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায় তা তাদেরকে দেওয়া হবে।' (মুসলিম)

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনি সারা জাহানের মালিক। জগতের সব কিছু তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার মুখাপেক্ষী। তাঁর অসংখ্য নেয়ামত আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ করি। তাই সর্বদা তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনিই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। তিনি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী। তিনি শুধু ইহকালের মালিক নন পরকালেরও মালিক। পরকালের হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম সবকিছুই তাঁর অধীন। শেষ বিচারের কালে তিনিই একমাত্র বিচারক। জ্বিন-ইনসানের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন তিনিই । অতঃপর পুণ্যবানদের তিনি পুরস্কার স্বরুপ দিবেন জান্নাতের অনাবিল সুখ শান্তি আর পাপীদের দিবেন জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি। এদিনের নিরঙ্কুশ মালিকানা কেবল তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকট সুপারিশও করতে পারবে না। তিনি ইচ্ছা করলে কোন বান্দাকে বিনা হিসেবেও জান্নাত দিতে পারেন। তাই সকল প্রশংসা ও ইবাদাতের শুধু তাঁরই প্রাপ্য। এতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।

সুরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহর অসীম কুদরত ও একচ্ছত্র ক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মানুষ কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং শুধু তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। সকল ব্যাপারে শুধু তারই উপরে ভরসা করবে। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। এসব কথা বলা হয়েছে সূরাটির মধ্যবর্তী আয়াতে।

মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের ভাল-মন্দ তাঁরই হাতে। কিসে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ তা এক মাত্র আল্লাহই জানেন। সত্য-ন্যায় ও হেদায়াতের পথ কোনটি তা শুধু তিনিই জানেন। তিনিই সত্য ও সঠিক পথের মালিক । মানুষ মহান আল্লাহর নিকটই সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহর নিকট কিভাবে প্রার্থনা ও মুনাজাত করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এ সূরার শেষ তিনটি আয়াতে। মানুষের উচিত আল্লাহর নিকট সত্য, সুন্দর ও সরল-সঠিক পথের প্রার্থনা করা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যে পথে চলেছেন, নবি রাসুলগণ ও সত্যবাদীগণ যে পথ অনুসরণ করেছেন সে পথের দিশা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে মুনাজাত করা। অনুরূপভাবে যে পথে চলে মানুষ অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে যেমন ইয়াহুদি, নাসারাদের অনুসৃত পথ, তা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

সূরা আল-ফাতিহার নৈতিক শিক্ষা

সূরা ফাতিহা মহান আল্লাহর সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। বান্দা প্রতিনিয়ত সালাতে এ সূরা পাঠ করে মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের মালিক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বিচার দিনের অধিপতি। যাবতীয় প্রশংসা ও ইবাদাত বন্দেগীর একমাত্র প্রাপ্য তিনি। তিনি সকল সৃষ্টির লালন-পালনকারী। তিনিই মানবজাতিকে সত্য-সুন্দর ও সরল-সঠিক পথের দিশা দেন। মানুষের উচিত একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা এবং তারই কাছে যাবতীয় বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা । নবি-রাসুল ও আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ অনুসরণের তাওফিক কামনা করা। আর পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত ইয়াহুদি-নাসারাদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

সূরা আন-নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)

পরিচয়

কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সূরা হলো সূরা আন-নাস। এই সূরাটি কুরআন মাজিদের ১১৪ তম সূরা। সূরাটি সপ্তম হিজরিতে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আন-নাস এর আয়াত সংখ্যা ৬টি। সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরায় ব্যবহৃত اَلنَّاسِ (আন-নাস) শব্দ দ্বারা। অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে কীভাবে বাঁচা যাবে তা-ই এ সূরার আলোচ্য বিষয়।

শব্দার্থ

قُلْ	আপনি বলুন, তুমি বলো	شَرِّ	অকল্যাণ, অনিষ্ট, ক্ষতি
اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি আশ্রয় চাই, আমি সাহায্য চাই	اَلْوَسْوَاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা, খারাপ কাজের পরামর্শদাতা
رَبِّ	প্রতিপালক, পালনকারী, রব	اَلْخَنَّاسِ	আত্মগোপনকারী, যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে
اَلنَّاسِ	মানুষ, মানবজাতি	الَّذِىْ	যে
مَلِكِ	মালিক, অধিপতি	يُوَسْوِسُ	যে কুমন্ত্রণা দেয়
اِلٰهِ	ইলাহ, মাবুদ, উপাস্য	صُدُوْرِ	বক্ষসমূহ, অন্তরসমূহ
مِنْ	হতে, থেকে	اَلْجِنَّةِ	জিন

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়,পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ	বল, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের,
مَلِكِ النَّاسِ ۙ	মানুষের অধিপতির,
اِلٰهِ النَّاسِ ۙ	মানুষের ইলাহ এর নিকট।
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ	আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা অনিষ্ট থেকে,
الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ	যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۙ	জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআন মাজিদের সূচনা হয়েছিল সূরা আল-ফাতিহার মাধ্যমে। সেটিতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণাবলি উল্লেখ করে তাঁর কাছে সরল পথের হেদায়াত দান করার জন্য দোয়া করা হয়। কিন্তু সরল পথে চলার ক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষ থেকে অনেক বাধা এবং কুমন্ত্রণা আসতে পারে। তাই কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সূরায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে আমরা শয়তানের অনিষ্ট ও ধোঁকা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি।

সূরা আন-নাস এর প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার তিনটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো, প্রতিপালক, মালিক, উপাস্য। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি গুণ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো সত্তার জন্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি উল্লেখ করে, তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি করে তাঁর কাছে অভিশপ্ত শয়তানের ধোকা ও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। মানুষ নিজের ক্ষমতা ও শক্তিতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য থাকলেই শয়তানের ধোকা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচা সম্ভব। মহানবি (সা.) বলেন- 'কোনো শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, শয়তান তার অন্তরে চেপে বসে থাকে। বড় হয়ে সে যদি আল্লাহর স্মরণ (যিকির) করে তাহলে শয়তান অদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি আল্লাহর স্মরণ না করে তাহলে সে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।'

মানুষকে কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান দুই ধরনের। এক প্রকার শয়তানকে দেখা যায় না। তারা অদৃশ্য হয়ে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। তারা জিন শয়তান। আর অন্য প্রকার রয়েছে মানুষের মাঝে। মানুষ শয়তানও মানুষকে খারাপ কাজ করতে উৎসাহ যোগায় ও ধোঁকা দেয়। উভয় ধরনের শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহর ইবাদাত থেকে ফিরিয়ে রাখে। ভালো কাজ করতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচা যায় না। তাই সূরা আন-নাস এ এই দুই প্রকার শয়তান থেকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

সূরার আন-নাস-এর নৈতিক শিক্ষা

পৃথিবীতে আমরা এসেছি আল্লাহর আনুগত্য এবং ইবাদাত করার জন্য। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তিনি আমাদের মালিক। তিনিই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কুমন্ত্রণা দেয়। আমাদেরকে খারাপ পথে নিয়ে যেতে চায়। আমরা যদি আল্লাহর স্মরণ করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি তাহলে শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে না। আমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

সূরা আল-ফালাক (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

পরিচয়

সূরা আল-ফালাক পবিত্র কুরআন মাজিদের ১১৩ নম্বর সূরা। এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ব্যবহৃত আল-ফালাক (اَلْفَلَقِ) শব্দ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস এর মাঝে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই সূরা দুটি একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, লাবিদ ইবন আসিম নামক এক ইয়াহুদি তার কন্যার মাধ্যমে মহানবি (সা.) এর উপর যাদু করেছিল। তারা গোপনে মহানবি (সা.) এর একটি চুল সংগ্রহ করে তাতে এগারোটি গিরা দিয়ে যাদু করে। মহানবি (সা.) যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং খুব কষ্ট পান। তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরা দুটি একসঙ্গে অবতীর্ণ করেন। মহানবি (সা.) কে নির্দেশ দেয়া হয় যেন তিনি সূরা দু'টির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যাদু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সূরা দুটিতে মোট এগারোটি আয়াত রয়েছে। এক একটি আয়াত পাঠ করে গিরাতে ফুঁক দিলে যাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। মহানবি (সা.) যাদুর ক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

হাদিসে আছে- এই সূরা দুটি পড়ে ফুঁক দিলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। আর যে নিয়মিত সূরা দুটি পাঠ করে তাকে কোন যাদু ক্ষতি করতে পারে না। মহানবি (সা.) রাতে ঘুমানোর সময় সূরা দুটি পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীর মুছে নিতেন।

শব্দার্থ

قُلْ	তুমি বলো, আপনি বলুন	اِذَا	যখন
رَبٌّ	প্রতিপালক, স্রষ্টা, রব	وَقَبَ	আচ্ছন্ন হলো, গভীর হলো
اَلْفَلَقُ	ভোর, প্রভাত, ঊষা, সকাল	اَلنَّفّٰثٰتُ	ফুঁকদানকারী নারীগণ
مِنْ	থেকে, হতে	الْعُقَدُ	গ্রন্থিসমূহ, গিরাসমূহ
شَرٌّ	অনিষ্ট, ক্ষতি	فِي	মধ্যে,ভিতরে
خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন	حَاسِدٌ	হিংসাকারী, হিংসুক
غَاسِقٌ	রাতের অন্ধকার	حَسَدَ	সে হিংসা করল, সে ঈর্ষা করল

অনুবাদ

আয়াত	অনুবাদ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝	বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝	তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝	রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়,
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝	এবং অনিষ্ট থেকে ঐ সমস্ত নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝	এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে ।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম। এই সূরা দুটিতে কীভাবে বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে তা শেখানো হয়েছে। সূরা আন-নাস এ বিশেষভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। আর সূরা আল-ফালাকে শেখানো হয়েছে বিভিন্ন মাখলুকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়। আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। কোনো কিছুই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে হিকমত এবং কল্যাণ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কিছু ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেন বান্দা সেসবের ক্ষতির ভয়ে পৃথিবীর সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষি হয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই সূরায় অন্ধকার রাতের বিপদ থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ রাতের অন্ধকারেই অধিকাংশ খারাপ কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যাদুকররা তাদের ক্ষতিকর যাদুর কাজ সাধারণত রাতের বেলায় করে থাকে। সূরার চার নং আয়াতে নারী যাদুকরের কথা বলা হলেও এখানে নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার যাদুকর উদ্দেশ্য। কারণ যাদুকর পুরুষ হতে পারে আবার মহিলাও হতে পারে। উভয় প্রকার যাদুকরের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও সূরার শেষ আয়াতে হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিলে আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের অনিষ্ট থেকে মানুষকে আশ্রয় প্রদান করেন।

সূরা আল-ফালাক-এর নৈতিক শিক্ষা

পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, ক্ষতিকর, উপকারী সবকিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা। সবই তাঁর অধীন। তাই এসবের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এবং এগুলোর উপকার লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

সূরা আল-ইখলাস (سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ)

পরিচয়

সূরা আল-ইখলাস আল-কুরআনের একটি ছোট সূরা; কিন্তু এর ফযিলত ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশি। এটি আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাযিল হয়। এর ফযিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারি ও মুসলিম) অন্য এক হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (সা.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (তিরমিযি) অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে, তা তাকে বালা-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট। (আবু দাউদ)

শব্দার্থ

قُلْ	তুমি বলো, আপনি বলুন	لَمْ يَلِدْ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি
هُوَ	তিনি, সে	لَمْ يُوْلَدْ	তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি
اَحَدٌ	একক, এক-অদ্বিতীয়	كُفُوًا	সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ
اَلصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়,পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ	বলুন, (হে নবি!) তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ	আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)।
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ	আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

শানে নুযূল

মক্কার মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত। তারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জানত না। একবার তারা মহানবি (সা.) এর নিকট আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন। (তিরমিযি)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরো প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরি- স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর? তাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা

এ সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার তাওহিদ বা একত্ববাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। সূরাটিতে সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। যারা আল্লাহর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতে কেউ তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

আমরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না। এই সূরাটিকে ভালোবাসবো এবং বেশি বেশি তিলাওয়াত করার চেষ্টা করব।

শিক্ষা:

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।
- তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতাপিতা কেউই নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা আল-হুমাযাহ (سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ)

পরিচয়

সূরা আল-হুমাযাহ আল কুরআনের ১০৪তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৯টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। হুমাযাহ শব্দের অর্থ পশ্চাতে নিন্দাকারী। এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'হুমাযাহ' অনুসারে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরাটিতে তিনটি জঘন্য গুনাহ ও তার শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গুনাহ তিনটি হল গীবত, সামনাসামনি মন্দ বলা ও অর্থলিপ্সা। আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব এবং এ সূরার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَيْلٌ	দুর্ভোগ, ধ্বংস	لَيُنْبَذَنَّ	অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে
لِكُلِّ	প্রত্যেকের জন্য/ সকলের জন্য	اَلْحُطَمَةُ	হুতামাহ, একটি জাহান্নামের নাম
هُمَزَةٌ	পশ্চাতে নিন্দাকারী	مَآ اَدْرٰىكَ	আপনি কি জানেন?
لُمَزَةٌ	সম্মুখে নিন্দাকারী	نَارُ	আগুন
جَمَعَ	সে জমা বা একত্র করেছে, সে সঞ্চয় করেছে	اَلْمُوْقَدَةُ	প্রজ্বলিত
مَالًا	মাল, ধন-সম্পদ	تَطَّلِعُ	তা গ্রাস করবে
عَدَّدَهٗ	সে তা বারবার গণনা করেছে	اَلْاَفْئِدَةُ	হৃদয়সমূহ, অন্তরসমূহ
يَحْسَبُ	সে ধারণা করে, সে হিসাব করে	مُّؤْصَدَةٌ	পরিবেষ্টিত
اَخْلَدَهٗ	তা তাকে অমর করেছে, তা চিরস্থায়ী করেছে	عَمَدٌ	স্তম্ভসমূহ, খুঁটিসমূহ
كَلَّا	কখনো নয়	مُّمَدَّدَةٌ	দীর্ঘায়িত, প্রলম্বিত

অনুবাদ

আয়াত	অনুবাদ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ	দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।
الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ	যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ	সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।
كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ	কখনো না; সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ	আর আপনি কি জানেন, হুতামাহ কী?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ	এটি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।
الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ	যা অন্তরসমূহ গ্রাস করবে।
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ	নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে।
فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۙ	দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

শানে নুযূল

উমাইয়া ইবনে খালফ, ওলীদ ইবনে মুগিরা ও আখনাস ইবনে শুরায়ক মহানবি (সা.) ও মু'মিনদের গিবত করত এবং তাদের অর্থলিপ্সা ছিল প্রবল। তাদের এই অপকর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল- হুমাযাহকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম তিন আয়াত নিয়ে প্রথম অংশ এবং শেষ ছয়টি আয়াত নিয়ে দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি জঘন্য গুণাহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এসব গুণাহের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এ সূরায় বর্ণিত গুনাহ বা পাপ কাজগুলো হলো :

ক. পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা। একে গিবতও বলা হয়। এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের অন্য আয়াতে গিবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক।' (বায়হাকী)

খ. সামনাসামনি কারো নিন্দা করা। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। অনেক সময় এ কারণে সমাজে ঝগড়া, মারামারি ও গন্ডগোল সৃষ্টি হয়।

গ. ধন-সম্পদ জমা করা ও বারবার তা গণনা করা। এর দ্বারা অতিশয় অর্থলিপ্সা বোঝানো হয়েছে। ধন-সম্পদের প্রতি অতি লোভ মানুষকে বিপদগামী করে। সে হালাল-হারাম বিবেচনা না করে যে কোনোভাবে অতিমাত্রায় অর্থ উপার্জন করতে থাকে, এভাবে তার সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও মনের দিক থেকে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। গরিব-দুঃখীদের অধিকার আদায় করে না। যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরয ইবাদাতও পালন করে না। বরং সে সম্পদ জমা করতে থাকে এবং ধারণা করে যে, এসব ধন-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত তিনটি জঘন্য কাজের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গিবত, সামনাসামনি মন্দ বলা ও অর্থলিপ্সা- তিনটিই খারাপ কাজ। এগুলো কবিরা গুনাহ। এজন্য আখিরাতে মানুষকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থ মানুষকে অমর করে রাখবে- এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং সকল মানুষকেই মরতে হবে। তারপর হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের হিসাব নিবেন। যারা দুনিয়াতে এ তিনটি জঘন্য কাজ করে আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের স্থান হবে হুতামাহ নামক জাহান্নামে।

হুতামাহর আগুনে ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলবে। এমনকি তাদের হৃদয় বা অন্তরও ঐ আগুনে পুড়বে। কোন কিছুই আগুনের গ্রাস থেকে রেহাই পাবে না। দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত আগুন পৌঁছাবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবিত অবস্থাতেই মানুষ সেখানে অনুভব করবে।

শিক্ষা:

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন:

- পশ্চাতে বা গোপনে কখনো কারো নিন্দা করব না।
- কখনো সামনাসামনি কারো নিন্দা করব না।
- অর্থের প্রতি লোভ করব না। বরং আল্লাহ তা'আলা যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকব এবং প্রয়োজনমত তা খরচ করব।
- জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর।
- আমরা উল্লিখিত গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকব, যাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাই।

অর্থসহ মুনাজাতের তিনটি আয়াত

আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছি। প্রতিনিয়ত আমরা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করি। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করলে মহান আল্লাহ অখুশি হন। পার্থিব উপকরণসমূহ পাওয়ার জন্য আমরা অনেক কষ্ট করে থাকি। মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে এগুলো আমাদের দান করেন। দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত নেয়ামতের মালিক মহান আল্লাহ। তাই এগুলো অর্জন করোর জন্য তাঁরই নিকটে প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনকিছু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করাকে মুনাজাত বলে। মুনাজাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। হাদিসে মুনাজাতকে ইবাদাতের সারবস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মুনাজাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে মুনাজাতমূলক অনেক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মুনাজাতের আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলো শিখব এবং এর অর্থ জানব। এর পর এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দোয়া করব।

আয়াত-১

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করুন; আর আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করুন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১)

প্রত্যেক মুমিন বান্দা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে জীবিত করা হবে এবং তাঁর কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। মৃত্যুর পরবর্তী এই সময়কে বলা হয় আখিরাত। আখিরাতের সময়কাল পৃথিবীর মতো অস্থায়ী নয়। বরং তা হবে অনন্ত, অসীম যার কোনো শেষ নেই। একজন মানুষের আখিরাত আনন্দময় হবে নাকি কষ্টের হবে তা নির্ভর করে দুনিয়ায় সে কী আমল করেছে তার উপর। কেউ যদি দুনিয়ায় ভালো কাজ করে, আল্লাহর আনুগত্য করে তাহলে তার আখিরাত সুন্দর হবে। অপরদিকে কেউ যদি দুনিয়ায় খারাপ কাজ করে তাহলে তাকে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। পৃথিবী হলো মুমিন বান্দার পরীক্ষার ক্ষেত্র। এজন্য একজন মু'মিনের দুনিয়ার জীবন গুরুত্বপূর্ণ আবার আখিরাতের জীবনও গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন শুধু দুনিয়ার কল্যাণ কামনা না করে। বরং দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও সফলতা চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে।

আয়াত-২

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি তাঁদের দুজনকে (বাবা ও মা) দয়া করুন। যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৪)

আমরা পৃথিবীতে এসেছি আমাদের বাবা ও মায়ের মাধ্যমে। তাঁরাই আমাদেরকে লালনপালন করে বড় করেছেন। যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারতাম না, নিজেদের হাতে খেতে পারতাম না, তখন মা-বাবা আমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন। তাঁরা নিজেরা শত কষ্ট সহ্য করেও আমাদেরকে সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের সুখ-শান্তির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা আমাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছেন। মা গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করেছেন। বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে আমাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। এসবের কোনো বিনিময় এবং প্রতিদান দেয়া আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দোয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা যেন এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে মা বাবার জন্য কল্যাণ কামনা করি।

আয়াত-৩

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন।' (সূরা তা-হা, আয়াত: ১১৪)

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অসংখ্য মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। সাগরে প্রকাণ্ড নীল তিমি, স্থলের বিশালদেহী হাতি আরো কত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে কত বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। । কিন্তু সকল কিছুর উপরে মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে মর্যাদা দেয়ার একটিই কারণ- আর তা হলো মানুষের জ্ঞান ও বিবেক। মানুষ তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে যা অন্য কোনো প্রাণির পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মহানবি (সা.) বলেন- সকল মুসলিমের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয। সকল জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র জ্ঞানদাতা। তিনি যাকে খুশি তা দান করেন। তাই আয়াতে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মুনাজাত করে। আমরা জ্ঞানার্জনে কোন অবহেলা করব না। সর্বদা উপকারী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সকল জ্ঞানের উৎস মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব।

আল- হাদিস (اَلْحَدِيْثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা,বাণী। ইসলামের পরিভাষায় মহানবি (সা.)- এর বাণী, কর্ম ও তাঁর মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয়। সাহাবিগণ মহানবি (সা.)-এর সামনে ইসলামী শরীআত সম্পর্কিত কোন কথা বলেছেন বা কোন কাজ করেছেন আর মহানবি (সা.) তা নিষেধ করেননি কিংবা নীরব থেকেছেন এটাকে বলা হয় মৌন সম্মতি।

মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশায় প্রথম দিকে কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কায় হাদিস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আরবের লোকদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ছিল প্রখর। তাঁরা যা শুনতেন তা-ই তাদের মুখস্থ হয়ে যেত। মহানবি (সা.) তাঁদেরকে হাদিস মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করেন। মহানবি (সা.) বলেন- 'ঐ ব্যক্তি ধন্য হবে যে আমার হাদিস শুনবে, সংরক্ষণ করবে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে।'(তিরমিযি) মহানবি (সা.)-এর এ বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহাবিগণ হাদিস মুখস্থ করেন এবং তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। মহানবি (সা.)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীন ও উমাইয়া শাসনামলে দীর্ঘদিন এভাবে প্রধানত: হাদিস মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া সাহাবিগণ হাদিস শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে হাদিসের প্রসার ও প্রচার করেন। বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে তাঁদের নিকট হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো কোনো সাহাবি ও তাবে'ঈ মহানবি (সা.)-এর বহু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

হিজরি ১০০ সালে উমাইয়া খলিফা উমর ইবন আব্দুল আযীয সরকারিভাবে হাদিস লিখার হুকুম জারি করেন। পরবর্তীকালে হিজরি তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমস্ত হাদিস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এ সময় হাদিসের বেশ কিছু বিশুদ্ধ কিতাব সংকলন করা হয়। এর মধ্যে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতেও হাদিস সংকলন অব্যাহত থাকে। আর এভাবেই আমরা মহানবি (সা.)-এর হাদিস লাভ করি।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদিস ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মাজিদের পরই সুন্নাহ বা হাদিসের স্থান। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে ইসলামের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মহানবি (সা.) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণই হচ্ছে হাদিস। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কুরআন মাজিদে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু দিনে রাতে কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকআত পড়তে হবে, কিভাবে রুকু-সিজদাহ করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। অনুরূপভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কত পরিমাণ দিতে হবে, তার কোন উল্লেখ কুরআন মাজিদে নেই। আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবি (সা.) এ গুলোর বিস্তারিত নিয়ম কানুন বর্ণনা করেছেন হাদিসের মাধ্যমে। এ কারণেই কুরআনের ন্যায় হাদিসের গুরুত্ব অপিরসীম। তাই কুরআন বুঝতে ও সে অনুসারে আমল করতে হাদিস অপরিহার্য। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ : 'রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা- আল-হাশর,আয়াত: ৭)

মহানবি (সা.) হাদিসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন- 'আমি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এই দুটি আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অন্যটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

অর্থসহ নৈতিকগুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিস

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও নির্দেশ যেমন মানুষকে সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি রাসুলের হাদিসও সমগ্র মানব জাতিকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পারচালিত করে। অতএব আমরা বলতে পারি মানব জীবনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

কথায় ও কাজে সৎ-সুন্দর ও মার্জিত থাকার নাম নীতি ও নৈতিকতা। মানব জীবনে নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। তাকে সকলে ঘৃণা করে। তার সাথে কেউ লেন-দেন ও চলা-ফেরা করে না। সে সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করতে পারে না। পক্ষান্তরে নীতিবান মানুষকে সকলে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। সকলে তাঁর অনুকরণ করে। সকলে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম নীতির অধিকারী। কোন অনিয়ম তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি।

তিনি সর্বদা নীতি ও আদর্শের পরিপূর্ণ অনুশীলন করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র তথা উত্তম নীতি নৈতিকতার পরিপূর্ণতা দানের জন্য। মহানবি (সা.) পবিত্র হাদিসে মানব জাতিকে নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে নীতি-নৈতিকতামূলক দুটি হাদিস অর্থসহ উল্লেখ করা হল। আমরা এগুলো শিখব এবং এর শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব।

হাদিস-১

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (مُسْنَدُ أَحْمَد)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে না, তার ইমান নেই আর যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার দীন নেই অর্থাৎ সে প্রকৃত দীনদার নয়।' (মুসনাদ আহমাদ)

শিক্ষা

দুনিয়া এবং আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্য একজন মানুষকে ভালো গুণাবলি অর্জন করতে হয়। যে গুণাবলি তাকে আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে পছন্দনীয় করে তোলে। আমানত রক্ষা করা এবং ওয়াদা পালন করা সেগুলোর মাঝে অন্যতম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা অনেকের সাথে অনেক ওয়াদা করে থাকি। সেই ওয়াদাগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি আমরা ওয়াদা পালন না করি তাহলে মানুষের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে এবং আল্লাহর কাছে আমরা খারাপ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হব। ওয়াদা পালন না করার জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের শাস্তি পেতে হবে।

একইভাবে কেউ যখন আমাদের কাছে কোনো কিছু আমানত রাখবে, আমাদের দায়িত্ব হলো সেই আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। যদি আমানতের খেয়ানত করি অথবা আমানত রক্ষা না করি তাহলে আমাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাই আমরা ওয়াদা পালন করব এবং আমানত রক্ষা করব। মহানবি (সা.) মানব জাতিকে এই হাদিসের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মুমিন ও দীনদার হওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

হাদিস-২

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ (بُخَارِى وَمُسْلِم)

অর্থ : 'সত্য (মানুষকে) পুণ্যের পথে পরিচালিত করে । আর পুণ্য জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

শিক্ষা

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। প্রকৃত কথা, কাজ, বিষয়, অবস্থা ইত্যাদি গোপন না করে হুবহু প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদীকে সকলে পছন্দ করে, ভালোবাসে। সকলে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সত্যবাদী ছিলেন। তিনি জীবনে কোন মিথ্যা বলেননি। তিনি মানুষকে সত্য কথা বলা ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা সত্য মানুষকে সকল পাপাচার থেকে বিরত রাখে। সত্যবাদী লোক কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে না। সর্বদা ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। ফলে তার ইহকালীন জীবন যেমন সুন্দর ও সার্থক হয় তেমনি আখিরাতে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে।

যেহেতু সততা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্যের পথে ধাবিত করে। আর পুণ্য জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সুতরাং আমরা সর্বদা কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ হবো এবং মিথ্যা পরিহার করব। তাহলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

অর্থসহ মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস

মুনাজাত মহান আল্লাহর একটি পছন্দনীয় ইবাদাত। মহান আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্কের সেতুবন্ধন হল মুনাজাত। আল্লাহ চান বান্দা যেন মুনাজাতের মাধ্যমে বেশি বেশি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তিনি বান্দার মুনাজাত কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন-

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ : 'তোমরা আমাকে ডাক,আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৬০)

মহানবি (সা.) উম্মতের মহান শিক্ষক। তিনি বলেন- 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' (ইবনে মাজাহ) তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। কোন পথের অনুসরণ করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে পারবে তা তিনি হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে কীভাবে মুনাজাত করতে হবে হাদিসের মাধ্যমে তা তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন। অসংখ্য মুনাজাতমূলক হাদিস রয়েছে। এখানে আমরা দুটি মুনাজাতমূলক হাদিস অর্থসহ শিখব এবং এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট ভক্তিসহকারে মুনাজাত করব।

হাদিস-১

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى، وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنٰى (مُسْلِم)

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি সঠিক পথের দিশা, আল্লাহভীতি, চারিত্রিক নির্মলতা ও স্বচ্ছলতা।' (মুসলিম)

মহানবি (সা.) তাঁর উম্মতকে অসংখ্য দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে তারা আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনা জানাবে। এই হাদিসটি তার মাঝে অন্যতম। এই হাদিসে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো বান্দা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। প্রথমটি হলো হেদায়াত বা সঠিক, সরল পথের সন্ধান। যে পথে চললে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে তাকওয়ার কথা। তাকওয়া হলো, সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করা। তৃতীয়ত বলা হয়েছে উত্তম চরিত্রের কথা। উত্তম চরিত্র মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ। আর সবশেষে বলা হয়েছে স্বচ্ছলতার কথা। এই চারটি বিষয় যদি কোনো মানুষের মাঝে পাওয়া যায় তাহলে সে ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে।

হাদিস-২

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا (اِبْنُ مَاجَه)

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান এবং পবিত্র রিযিক প্রার্থনা করছি।' (ইবন মাজাহ)

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সব ধরনের জ্ঞান দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য উপকারী হয় না। কিছু জ্ঞান অর্জন কেবল সময় নষ্ট ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে না। এজন্য মহানবি (সা.) আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন যেন আমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান চাই। এমন জ্ঞান যা আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। একইসঙ্গে হাদিসে আল্লাহর নিকট পবিত্র রিযিক চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারণ রিযিক পবিত্র না হলে বান্দার কোনো দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। তাই আমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান এবং পবিত্র রিযিক চাইব যেভাবে হাদিস শরিফে শেখানো হয়েছে।

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদিস

সততা, সত্যবাদিতা, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা, উন্নত চরিত্র, দয়া-মায়া, ক্ষমা, ভালোবাসা, পরস্পর সহযোগিতা -এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে এই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অনুসরণ অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। তাই আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে। এইরূপ নৈতিকতা ও মানবিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ হলো একজন মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন হয় সুন্দর ও উন্নত। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও ভালোবাসা। সমাজের সকলে এ আদর্শ অনুশীলন করলে সমাজ হয় সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিময় এক আবাসস্থল।

অন্যদিকে সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে সমাজে শান্তি থাকে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, ঐক্য, ভালোবাসা ইত্যাদি সদগুণাবলির চর্চা থাকে না। মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে। ফলে সমাজে নানা অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মহানবি (সা.)-এর হাদিস নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা পূর্বপাঠে হাদিসের পরিচয় লাভ করেছি। হাদিসের মাধ্যমে আমরা প্রিয়নবি (সা.) এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি মানুষের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন তা জানতে পারি। তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা জানতে পারি। তিনি আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তাও আমরা হাদিস পড়ে জানতে পারি।

হাদিস শরিফে প্রিয়নবি (সা.) আমাদের নানাবিধ নৈতিক ও মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। স্নেহ, মমতা, দয়া, ক্ষমা, সাম্য, মৈত্রী, ভাতৃত্ব, ভালোবাসা, পরস্পর সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আবার পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চুরি-ডাকাতি করা, গালিগালাজ করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ইত্যাদি খারাপ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, খোশামোদ-তোষামোদ ইত্যাদিও খারাপ অভ্যাস। এগুলো মানবিক আদর্শের বিপরীত। এগুলো নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। এগুলো থেকেও বিরত থাকার জন্য মহানবি (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ

অর্থ: 'আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর পাপ কাজ জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।' (মুসলিম)

সৎ গুণাবলির অনুশীলন ও অসৎ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্তম চরিত্রবান হতে পারি। এগুলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায়ও সাহায্য করে। এভাবে হাদিসের শিক্ষা আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

হাদিস শরিফে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনচরিত ও উত্তম চরিত্রের আদর্শ বর্ণিত আছে। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থ: 'আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল-কালাম, আয়াত: ৪)

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি সবসময় নৈতিক ও মানবিক গুণাবালি অনুসরণ করতেন। তাঁর একটি উপাধি ছিল আল-আমিন। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। কথা ও কাজে সততা অবলম্বন করতেন। কেউ কোন কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তিনি তা মালিকের নিকট যথাযথভাবে ফেরত দিতেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না, ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। ফলে তাঁর শত্রুরাও তাকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী নামে ডাকত।

এভাবে দেখা যায়, সবধরনের সৎগুণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, মিষ্টভাষী। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজ কখনো করতেন না। সারাজীবন তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ আদর্শ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিয়নবি (সা.)-এর চরিত্র অনুসরণ করলে কখনোই নৈতিক ও মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হবে না। বরং এর দ্বারা আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ মধ্যে রয়েছে উত্তম অনুপম আদর্শ ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ হাদিস শরিফে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ। আমরা হাদিস পড়ে এগুলো জানব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। তাহলে আমরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব।

ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

আমরা এখন পর্যন্ত ইসলামের যে বিধিবিধান সম্পর্কে জানলাম, তার মধ্যে অন্যতম হলো ইবাদাত যা আগের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি। আর এই ইবাদাতের সর্বোত্তম উপায় হলো সালাত আদায় করা। আগের অধ্যায় থেকে আমরা পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা সম্পর্কেও জেনেছি। এ অধ্যায়ে আরো জেনেছি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা, মুনাজাতের জন্য কিছু আয়াত এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। এবার তোমাদের একটি বিশেষ কাজ করতে হবে। তোমরা ইবাদাত সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা যা জেনেছ বা শিখেছ সেই সবকিছু মিলিয়ে একটি ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সেই অনুষ্ঠানে তোমাদের বন্ধুদের কেউ কুরআন তিলাওয়াত করবে, কেউ হামদ-নাত উপস্থাপন করবে, কেউবা সালাতের ওযু, গোসল, তায়াম্মুমের যেসব নিয়ম শিখেছ সেগুলো দিয়ে বানানো কোনো পোস্টার প্রদর্শন করবে, আবার কেউবা কুরআন এবং হাদিসের বানী উপস্থাপন করবে। কেউ আবার সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ফরয কাজগুলো কী সেগুলোও সবাইকে পোস্টার বানিয়ে দেখিয়ে বা মুখে বলে জানাতে পারো।

মানে হলো, তোমাদের একটি সুন্দর ইসলামি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে, যেখানে যেমন থাকবে তোমাদের নিজেদের আগে থেকে জানা ইসলামি কোনো উপস্থাপনা, একই সঙ্গে থাকবে ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বইটি থেকে এই পর্যন্ত যা যা তোমরা শিখেছ সেসবেরও উপস্থাপনা।

তাহলে দেরি না করে অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু করে দাও। আর এ বিষয়ে তোমাদের শিক্ষকের সহায়তা নাও। কবে কখন অনুষ্ঠানটি হবে, সেটি শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নাও, আর বন্ধুরা সবাই নিজেদের কাজ ভাগ করে নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করে দাও!

তাহলে এখন তোমাদের কাজ হলো–

কাজ-১২: (ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন)

- অনুষ্ঠানে কে কী উপস্থাপন করবে তা শিক্ষকের সহায়তায় ঠিক করা।
- অনুষ্ঠান উপস্থাপনের জন্য কুরআন তিলাওয়াত, হামদ-নাত ইত্যাদি অনুশীলন করা, কোনো পোস্টার দেখাতে চাইলে সেগুলো তৈরি করে ফেলা।
- অনুষ্ঠানটি কীভাবে চলবে (অনুষ্ঠানসূচি) তা ঠিক করা।
- ইসলামিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষকের সহায়তায় সব বন্ধু মিলে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করবে। অনুষ্ঠানে তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করবে। তোমার বন্ধুদের কারও যদি কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে সেভাবে সহায়তা করবে। সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি পালন করতে পারলে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে।